হায়রে কৃষি!!!!!!!!!!

সাম্প্রতিক খাদ্য সংকট, একটি বিশ্লেষণ

দিনমজুর

ইদানিং সারাবিশ্বেই খাদ্য- পরিস্থিতি নিয়ে ব্যাপক আলোচনা শোনা যাচ্ছে, সকলকেই অনেক উদ্বেগ- উতকন্ঠার সাথে বর্তমান বাজার পরিস্থিতি পর্যালোচনা, বর্তমান খাদ্য সংকটের কারণ ও উৎস অনুসন্ধানে লিপ্ত থাকতে দেখা যাচ্ছে। বলা হচ্ছে, বিশ্বজুড়েই খাদ্যশস্যের উৎপাদন কমেছে, খাদ্যশস্যের মজুদও এখন অনেক কম। ফলে, হু হু করে বাড়ছে খাদ্যশস্যের দাম। খাদ্যশস্যের উৎপাদন কমার কারণ হিসাবে বলা হচ্ছে- জলবায়ুগত পরিবর্তনের কথা, বলা হচ্ছে কৃষিজমি হ্রাসের কথা প্রভৃতি। যদিও প্রকৃত কারণ, প্রকৃত অবস্থা এবং প্রকৃত সত্য অনুচ্চারিতই থেকে যাচ্ছে, যেমন করে বায়ুমণ্ডলে আমাদের বসবাস সত্তেও প্রায়ই তা সম্পর্কে আমরা খুব কম সচেতন থাকি।

প্রকৃত সত্যঃ

প্রকৃত সত্য হলো, এখনও দুনিয়ার মোট উৎপাদন- মোট চাহিদার তুলনায় বেশি। এটা ঠিক যে, বিগত কিছু সময়ে খাদ্য উতপাদন কিছু কমেছে, দুনিয়ার খাদ্য মজুদও কমছে। গত বছরে গমের মজুদ কমেছে ১১ শতাংশ। কিন্তু আসলেই কি সবজায়গাতে খাদ্য উৎপাদন কমেছে? উত্তর অবশ্যই না। বরং বেড়েছে। ১৯৮০ সালের তুলনায় বর্তমানে খাদ্যশস্য উৎপাদন বেড়েছে ৪০ শতাংশ- যা জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের তুলনায় অনেক বেশি, যদিও এসময় দুনিয়াব্যপি ক্ষুধার্তের (FAO 'ক্ষুধার্ত'কে এভাবে সংজ্ঞায়িত করে, একজন যে প্রতিদিন বেঁচে/ টিকে থাকার মত খাবারটুকুও পায় না) সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৮৫৪ মিলিয়ন- এই ক্ষুধার্ত জনগোষ্ঠী বৃদ্ধির হারও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের তুলনায় অনেক বেশি।

প্রকৃত অবস্থাঃ

<u>কিছু ডাটা দিয়ে প্রকৃত চিত্রটি পরিস্কার করি।</u>

১। গত বছরে দরিদ্র দেশগুলোর খাদ্য আমদানির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে শতকরা ২৫ ভাগ যা ১০৭ মিলিয়ন ডলারের সমপরিমাণ। (বিঃদ্রঃ ১০৭ মিলিয়ন ডলার মোট আমদানি নয় - এটা গত বছরে বাড়তি আমদানি!!)

২। খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (FAO) খাদ্য- মূল্য বৃদ্ধির ইনডেক্সে দেখা গেছে শতকরা ৪০ ভাগেরও বেশি মূল্য বৃদ্ধি ঘটেছে।

৩। গম ও তৈলবীজের মূল্য রেকর্ড পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। গমের মূল্য প্রতি টনে বৃদ্ধি পেয়েছে ১৩০ ডলার, এই বৃদ্ধির হার ৫২ শতাংশ।

৪। গত ৫ বছরে বিশ্ব খাদ্য সংস্থার খাদ্য ক্রয় মূল্য ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

৫। মানব খাদ্য উৎপাদনের পরিবর্তে বায়োফুয়েলের কাঁচামাল উৎপাদনে বিপুল বিনিয়োগ হয়েছে, এবং হচ্ছে। পশু খাদ্য উৎপাদনও বেড়েছে।

ফলাফল- পৃথিবীতে ক্ষুধার্তের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে, জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার প্রধান জ্যাসফ ডাফ জানিয়েছেন- খুব অল্প সংখ্যক লোকের খাদ্য কিনে খাওয়ার সক্ষমতা থাকবে- এভাবে চলতে থাকলে।

<u>এর বিপরীতে আরো কয়েকটি চিত্র দেখা যাক।</u>

১। যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের চাল রপ্তানির ১২ শতাংশ দখল করে আছে। ২০০৬ সালে আমেরিকা প্রায় ১.৮৮ বিলিয়ন ডলারের ধান উৎপাদন করেছে- যার প্রায় অর্ধেক রপ্তানি করে।

২। সাম্প্রতিক সময়ে উন্নত বিশ্বের কৃষি খাদ্যের বহুজাতিক কর্পোরেট কোম্পানিগুলোর অধিকাংশেরই নিট প্রফিট কয়েকগুন বৃদ্ধি পেয়েছে। এই বিশ্ব- রপ্তানি বাণিজ্য গুটিকয়েক কোম্পানির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। যেমন- মোট গম রপ্তানির ৮৫- ৯০% অংশীদারিত্ব মাত্র ৩- ৬ টি কোম্পানির, একইভাবে কফি রপ্তানির ক্ষেত্রে এই হার ৮৫- ৯০%, ধানের ক্ষেত্রে ৭০%।

৩। আমেরিকায় সরাসরি খাদ্যের জন্য ৫৮ ভাগ চাল ব্যবহার করা হয়, ১৬ভাগ ব্যবহার করা হয় প্রক্রিয়াজাত খাবার হিসাবে এবং ১০ ভাগ গৃহপালিত পশুর খাবার হিসাবে।

৪। ২০০৭ সালের প্রতিবেদন মতে ইউএসডিএ প্রকাশিত প্রতিবেদন মতে যুক্তরাষ্ট্র ৯০.৫ মিলিয়ন একর জমিতে ভুট্টা চাষ করার পরিকল্পনা করে- ১৯৪৪ সালের পরে যেকোন সময়ের তুলনায় বেশি। এত বেশি জমি ভুট্টার চাষের আওতায় আনার উদ্দেশ্য বায়োফুয়েল।

প্রকৃত কারণঃ

কৃষি উৎপাদন কমেছে স্বল্পোন্নত বা উন্নয়নশীল দেশসমূহে, তারাই সেকারণে তাদের খাদ্য চাহিদা পূরণের লক্ষে উন্নত দেশসমূহের উদ্বৃত্ত খাদ্যের দিকে হাত বাড়িয়েছে, খাদ্য শস্য আমদানি করতে বাধ্য হচ্ছে, এবং উন্নত দেশসমূহ খাদ্য উৎপাদনের ঘাটতি- মজুদ হ্রাস প্রভৃতি প্রচারণা তুলে- নিজেদের উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য চড়া মূল্যে বিক্রি করছে। বাংলাদেশসহ উন্নয়নশীল বা স্বল্পোন্নত বা অনুন্নত দেশসমূহে খাদ্য উৎপাদন হ্রাসে জলবায়ুগত দুর্যোগের প্রভাব থাকলেও তা নগন্য। বাংলাদেশের কৃষির একটি চিত্র গত লেখায় তুলে ধরেছি। এবারে আরো কিছু চিত্র তুলে ধরে দেখানোর চেস্টা করবো কিভাবে এই দেশসমূহের কৃষি উৎপাদন কমছে।
(উন্নত বিশ্বও কৃষি উৎপাদন কিছু কমিয়েছে- তবে সেটা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যেই বা কারণেই কমিয়েছে)!

১। অসম কৃষি ভর্তুকিঃ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার কৃষিচুক্তিতে স্বাক্ষর করার পর থেকে স্বল্পোন্নত/অনুন্নত দেশসমূহ কৃষি ভর্তুকি প্রায় শূণ্যের কোঠায় নিয়ে যেতে বাধ্য হয়। অথচ, যে উন্নত অর্থাত ওইসিডি দেশগুলোর কৃষি ভর্তুকির পরিমাণ ছিল ১৯৯৫ সালে ১৮২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, ১৯৯৭ সালে সেটা বেড়ে দাঁড়ায় ২৮০ বিলিয়ন ডলার, ২০০১ সালে ৩১৫ বিলিয়ন ডলারে, ২০০২ সালে ৩১৮ এবং ২০০৫ সালে এসে দাঁড়ায় কমবেশি ৩০০ বিলিয়ন ডলারে। যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি ১০০ ডলারে ভর্তুকি দিতে হয় ২৫ থেকে ৩০ ডলার। ইউরোপীয় ইউনিয়নে ভর্তুকির পরিমাণ ৪০- ৫০ ডলার।

২। মুক্তবাণিজ্যঃ কৃষিক্ষেত্রে কোটা ও উচ্চশুল্ক আরোপ করে তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহ কৃষিপণ্যের আমদানিকে প্রতিরোধ করেছিল। ১৯৯৫ সালে এগ্রিমেন্ট অন এগ্রিকালচার কৃষিচুক্তিতে স্বাক্ষর করার পর এই প্রতিরোধ ব্যবস্থা মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই কৃষিচুক্তি কোটা পদ্ধতি বাতিলের মাধ্যমে কৃষিবাজার উন্মুক্ত করতে এবং একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ কৃষিপণ্য স্বল্প শুল্কে আমদানি করতে বাধ্য করে।

ফলাফলঃ আমেরিকা ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের উচ্চ ভর্তুকির কারণে বিশ্বব্যপি কৃষিপণ্যের দাম কমে যায়। আর উল্টো দিকে- তৃতীয় বিশ্বে ভর্তুকি কমা, বেসরকারি খাতে কৃষি উপকরণের দাম বাড়া, রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ কমা প্রভৃতি কারণে কৃষি উৎপাদনের খরচ বাড়তে থাকে। আবার অন্যদিকে মুক্তবাজারের কারণে উন্নত দেশসমূহের কমদামের পণ্যের মুখে উন্নয়নশীল দেশের পণ্য টিকতে পারে না। ফিলিপিন, ভারত, শ্রীলংকা সহ উন্নয়নশীল দেশসমূহের অসংখ্য চাষী দেউলিয়া হয়ে পড়েছে। ফিলিপন বিশ্লেষক এইলেন কও বলেছেন, শস্যের মূল্য একবার কমে যাওয়ার কারণে দেখা গেছে, প্রতিযোগিতায় টিকতে পারবে না বলে অনেক কৃষক ভুট্টা জমিতেই রেখে এসেছেন এবং সেগুলো জমিতেই পঁচে নষ্ট হয়। ঘানার মাঠের মাঠ পতিত পরে থাকতে দেখা যায়, তারই পাশে দেখা যায়- আমদানিকৃত খাদ্য শস্যের বস্তা। ভারতের অন্ধ্রপ্রদেশে শুল্ক উদারনীতির কারণে ১৯৯৮ সালে কমপক্ষে ২৩৩ জন কৃষক আত্মহত্যা করে, আর ২০০২ সালে ২৬০০ এর বেশি কৃষক আত্মহত্যা করে।

বাংলাদেশে স্যাপ কর্মসূচির কথা এর আগের লেখায় আলোচনা করেছি। এবারে ভর্তুকি ও শুল্ক পরিস্থিতি দেখি।

১৯৯৫- ৯৬ অর্থবছরে বাংলাদেশ কৃষিখাতে যে ভর্তুকি দিয়েছে তা মোট কৃষি উৎপাদনের ১.৫৪%। ১৯৯৮- ৯৯ এ এই হার নেমে দাঁড়ায় ০.৮৯% য়ে, আর ২০০১- ০২ এই হার ছিল ০.৬৭%। এর মানেই হলো বর্তমানে বাংলাদেশে কৃষিতে আসলে তেমন কোনো ভর্তুকি দেয়া হয় না। যেটুকু সামান্য দেয়া হয় তা সেচ, সার ও বীজের ক্ষেত্রে খুব সামান্যই ক্ষুদ্র কৃষকের কাছে পৌঁছে। যদিও সাম্প্রতিক বছরগুলিতে কৃষিতে বাজেট বাড়ানো হয়েছে বলে দাবি করা হয়, কিন্তু বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে- প্রত্যক্ষ সেবা খাতে বাজেট আসলে কমে গেছে। ২০০৪- ০৫ অর্থ বছরে কৃষি বাজেট যেখানে ৯০% বেড়েছে, সেখানে কৃষি বিষয়ক প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে বাজেট বেড়েছে ২০০%, আর কৃষি সেবায় কমেছে ১০%।
অন্যদিকে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার কৃষিচুক্তির সঙ্গে তাল মিলিয়ে খুলে দেয়া হয় কৃষি পণ্যের বাজার। বাংলাদেশে শুল্ক হ্রাসের প্রবণতা আরো আগে বিশ্বব্যংক- আইএমএফ এর পরামর্শে শুরু হয়েছিল। ১৯৯২- ৯৩ এ বাংলাদেশে আমদানি শুল্কের মোট ১৫ টি ধাপ ছিল যেখানে সর্বোচ্চ শুল্ক ছিল ৩০০%। ১৩ বছর পর ২০০৪- ০৫ এ এসে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ শুল্কহার ২৫% (ধাপ চারটিঃ ০%, ৭.৫%, ১৫% ও ২৫%)।

এই দুই প্রভাবে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীরা আরো বেশি ঋণগ্রস্ত ও বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। বাড়ছে ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা, কমছে চাষযোগ্য জমির পরিমাণ। ২০০০- ০১ সালে মোট কৃষি জমির পরিমাণ ছিল ১ কোটি ৪৮ লাখ হেক্টর যা এই সময়কালে কমে হয়েছে ৮৪ লাখ হেক্টর।

এভাবে উন্নয়নশীল দেশের কৃষকদের সর্বস্বান্ত করে- দেশের কৃষিকে ধংস করে এবং খাদ্য শস্যের জন্য উন্নত দেশসমূহের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল বানিয়ে, তারপরে সুযোগ বুঝে খাদ্যশস্যের দাম বাড়িয়ে হাতিয়ে নেয় ইচ্ছামতন মুনাফার পাহাড়।

আর, আমাদের তথাকথিত নব্য উদারনৈতিক অর্থনীতিবিদেরা এখনও ঢোল পিটিয়ে যান- আজকের মুক্ত দুনিয়ায় অর্থনীতিকে বদ্ধ করে রাখা কাজের কিছু না(!), ফ্রি মার্কেটের সুবিধা আমাদেরও নিতে হবে(!!) কিংবা মোট জনগোষ্ঠীর দুই তৃতীয়াংশ জিডিপির মাত্র এক তৃতীয়াংশে ভূমিকা রাখছে এই খৃষি খাতে- তাহলে আসলে এই খাতে অত গুরুত্ব দেয়ার কিছুই নেই!!

আগের কিস্তিটি পাবেন এখানেঃ
http://www.mukto-mona.com/Articles/din_mojur/amader_krishi.htm

মতামত জানান এই ঠিকানায়ঃ
dinmojur@yahoo.com